Vol. 34 | No. 3 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি জসীমউদ্‌দীন

Volume	34
Issue	3
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বেগম সেলিমা খালেক
Published online	June 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i3.8
Pages	133-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কবি জসীমউদ্‌দীন

বেগম সেলিমা খালেক

কবিতা হচ্ছে কবির মনের নিজস্ব সৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির বাঙ্‌ময় প্রকাশ। কল্পনার জগতে তিনি একান্ত রূপে একা হলেও কল্পনাজগৎ থেকে যে-সব উপমা, রূপক, চিত্রকল্প, উৎপ্রেক্ষা টেনে আনেন তা প্রকৃত রূপে প্রকাশ করতে কবিকে আশ্রয় নিতে হয় নিজস্ব পরিবেশ এবং পরিমণ্ডলের দিকে। কবি দেশ-কাল এবং সমাজবহির্ভূত নন বলেই দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করতে পারেন না। সে কারণে দেশ-কাল সমাজচেতনা সীমিত ক্ষেত্রে হলেও কবির মানসপরিমণ্ডলে প্রতিফলন ঘটে প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা পরোক্ষ ভাবে।

জসীমউদ্‌দীনের বেলায়ও ঘটেছে ঠিক তাই। সমকালীন যুগ-জীবনের তরঙ্গদোলার প্রতিফলনের প্রকৃতি অন্য কবিদের থেকে জসীমউদ্‌দীন-কাব্যে সম্পূর্ণ আলাদা। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, জীবন বাস্তবতার প্রভাবই তাকে আধুনিক কবিদের থেকে আলাদা প্রকৃতির করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে মৌলবী মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩১) সম্পাদিত *মোসলেম ভারত* পত্রিকায় জসীমউদ্‌দীনের 'মিলন গান' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। স্বাদেশিকতার স্পর্শে জাগ্রত কবি লিখেছিলেন—

আয় তবে আজ দাঁড়াই সবে
বীরের মত দেশের বুকে,
স্বাধীন করি দেশের মাটি
বন্দিনী যে, ছেলের দুঃখে। [১]

কবির এই স্বদেশিকতার সুর আরও প্রকট হয়ে ওঠে এরও কিছুকাল পর অম্বিকা মজুমদারের মৃত্যুতে লিখিত 'অম্বিকা প্রয়াণ' নামক কবিতায়—

শোন ঘুমন্ত শোন পদানত
শোন্‌ হতভাগ্য জাতি

নিদ্রিত রাতে একা নিভে গেছে
নিশা জাগা তব বাতি।
কোহিনূর তব চুরি হয়ে গেছে—
দিল্লীর রাজ গদি
সাগরের জলে ভাসিয়া গিয়াছে
লয়ে বাদশাহী মোতি। ২

এই একই কালে কবি আপন স্বভাবের রাজ্যে ফিরে এসে পল্লীনিষ্ঠ পথে কবিতা লিখতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। 'মাটির ডাক' শীর্ষক কবিতায় এর প্রমাণ রয়েছে–

কোথায় যাস্ আয় আয় ফিরে
ও সোনার বরণ ছেলে
কাজল ঘন গাঁয়ের পথে
আসন দিচ্ছি মেলে। ৩

এখান থেকে শুরু করে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি পল্লীনিষ্ঠ পথে কাব্যসাধনা চালিয়ে গেছেন। এ পথ থেকে যখনই কিছু মাত্র ব্যতিক্রম সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন তখনই ভয়ঙ্কর ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজের পল্লীচেতনার সূত্রধরে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজেও পল্লীসংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ জেগে উঠেছিল, যা বিশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকেই লোকসংস্কৃতি চর্চার আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এই লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাথমিক প্রয়াস পল্লী গীতি গাথা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। জসীমউদ্‌দীন আধুনিক শিক্ষাসূত্রে যখন তার সঙ্গে যুক্ত হলেন, তখন স্বভাবতই তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশে অনুকূল হয়ে উঠেছিল। ৪ এ ছাড়াও অসহযোগ আন্দোলনের সময় গ্রামে ফিরে যাওয়ার আহ্বান তাঁকে পল্লীনিষ্ঠ পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ৫

জসীমউদ্‌দীনের সৃষ্টিশীল কবিসত্তার পরিধি বহু বিস্তৃত। তাঁর কাব্যজীবনের সূচনা থেকে সর্বশেষ কাব্য গ্রন্থের কাল পর্যন্ত তা সক্রিয়। ৬ জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্য *রাখালী* কাব্যের 'কবর' কবিতা অসহযোগ আন্দোলনের কালেই রচিত হয়েছিল। দেশকালের প্ররোচনা জসীমউদ্‌দীন অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তা হলেও অসহযোগ আন্দোলনের বা সমকালীন দেশ–কালের এসব প্ররোচনা *রাখালী* কাব্যে তো নাই–ই এমন কি অসহযোগ আন্দোলনের কালে রচিত 'কবর' কবিতাতেও বিন্দুমাত্র নেই। একজন বৃদ্ধ তার স্ত্রী ছেলে–মেয়ে, নাতনী সবাইকে হারিয়ে জীবনসায়াহ্নে বুকের হাহাকার তার একমাত্র অবলম্বন কিশোর পৌত্রের কাছে বর্ণনা করছেন—আপাতঃদৃষ্টিতে 'কবর' কবিতার মূল উপকরণ এটুকুই। কবি –তাটি পাঠ করলে বৃদ্ধের করুণ দুঃখের কাহিনী কেবল কবির বর্ণনা মাত্র থাকেনা।

পাঠক মাত্রেরই মন করুণায় ব্যথিত হয়ে দেশ-কাল ছাপিয়ে সার্ব-জনীনতা লাভ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশের দশকে শিল্পের সংরক্ষণ ও শিল্পের প্রসার ঘটলেও শিল্পোন্নয়নের জন্য কাঁচামালের অভাবে পরিপূর্ণ শিল্পায়ন সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক পটভূমিতে যুগ-যন্ত্রণার তাগিদে শিল্পায়ন শুরু হলেও আমাদের দেশ কৃষি এবং পল্লীপ্রধান। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে এই পল্লীকে পেয়েছি নানা বর্ণনায়। এই পল্লীর কৃষকের জীবন ও প্রকৃতি *নক্‌সী কাঁথার মাঠ*-এর পট তৈরী করেছে। গ্রামীণ কৃষকের জীবনের সামগ্রিক ছবি এখানে পাই, *সোজন বাদিয়ার ঘাট*-এ তাই। কল-কারখানার প্রসারে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে মানুষ শহরমুখী হলেও পল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। পল্লীর সঙ্গে এ যোগাযোগ জসীমউদ্‌দীনের জীবনেও ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জসীমউদ্‌দীন শহরে বাস করেও তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের একটা বিরাট অংশ কেটেছে পল্লীতে। নিজ জীবনাভিজ্ঞতা ও পল্লীশিল্পীর চোখে দেখা পল্লী *রাখালী, নক্‌সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট*- এর গ্রামীণ জীবনের শক্তি ও সৌন্দর্য ও পল্লীজীবনের গভীরতর সমস্যার ছাপ প্রকাশিত হয়েছে। এমন পল্লীনিষ্ঠ এবং পল্লীজীবনসম্পৃক্ত কাব্য খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে। *রাখালী, নক্‌সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট*- এর কালে দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্র নাথ, এবং রবীন্দ্রনাথ কাব্যসাধনার পথকে সুগম করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- "অতি সহজে যাদের লিখবার ক্ষমতা নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তাঁরা কখনই লিখতে পারে না।"[৭] *রাখালী* কাব্য থেকে *নক্‌সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট,* ও *হাসু* পর্যন্ত এক দশকের স্বল্পকালের রচনায় পল্লীনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টি ও রচনাকৌশলের অভিনব লক্ষণটি পরিস্ফুট হয়েছে। এই পর্বে চিন্তালেশহীন দ্বন্দ্বমুক্ত একটি অবারিত প্রসন্নতার সুর লক্ষণীয়।

নক্‌সী কাঁথার মাঠ ও *সোজন বাদিয়ার ঘাট* –এ উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত কৃষকের প্রত্যহিক জীবনধারা এবং সমাজচিত্র স্পড়ষ্টতর রেখায় ধরা পড়েছে। আমাদের শহরে সমাজের অবজ্ঞার বোঝা মাথায় নিয়ে আমাদের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান কৃষাণেরা যে প্রাত্যহিক জীবন যাপন করছে, তার সাথে কবির রয়েছে নাড়ীর সম্বন্ধ। পল্লীর এই মূক বধির জনসাধারণের ভিতরে যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হৃদয়ের মিল রয়েছে, কবি তা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই, তাদের বিশ্বাস, সংস্কার, জীবনযাত্রার পদ্ধতি কবির কাছে অতি স্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই তার কাব্যের মূল উপাদান।[৮] এখানে একান্ত ভাবেই গ্রামীণ সংস্কৃতির এবং পদ্মা, মেঘনার পলি মাটির সজীবতায় পুষ্ট আবহমান কৃষক মানসের প্রাত্যহিক জীবনধারা ও সমাজচিত্রণে অসাম্প্রদায়িক থেকেছেন। *নক্‌সী*

কাঁথার মাঠ ও *সোজন বাদিয়ার ঘাট* এই দুই আখ্যান কাব্যে কবি যেন পল্লীর মাটিতে কান পেতে, সেই মাটির মানুষের কথা শুনেছেন — কাব্য দুখানি যেন পল্লীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কবির মানসভ্রমণ। গেঁয়ো কৃষকদের সঙ্গে যে ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ, হৃদয়গ্রাহিতা ও সহজ সংস্কার রয়েছে কবি তাই এখানে সুন্দরভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন। পল্লীর প্রতিটি ক্ষেত্রে কবি তাঁর মানসবিহার চালিয়েছেন। এই কাব্যে *সোজন বাদিয়ার ঘাট*-এ এর গল্পাংশের ঘটনার যোজনায় ও পরিবেশসৃষ্টিতে যে চমৎকারিত্ব রয়েছে তা আমরা *নক্‌সী কাঁথার মাঠ*-এ পাইনা। আর এখানে যে মননশীলতা রয়েছে, কবির রচিত অপর কোন গ্রন্থে তা নেই। *নক্‌সী কাঁথার মাঠ*-এ কবির ক্ষুদ্র দৃষ্টি ক্ষুদ্র একটি করুণ কাহিনীতে সীমাবদ্ধ। পরিবেশের তেমন আয়োজন নেই। পল্লীর বাস্তব চিত্র ক্ষুদ্র পরিসরে সমাপ্ত। আর কবির দৃষ্টিতেও যেন তেমন ব্যাপকতা নেই। কবি যেন এখানে কোন রকমে কাজ সেরে নিয়েছেন। *নকসী কাঁথার মাঠ* কাব্যে যে মাধুর্য রয়েছে, তা হল এর করুণ রস ও রোমান্সের মিশ্রণে। কিন্তু *সোজন বাদিয়ার ঘাট*-এ পল্লীর সবকিছু যেন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে — পল্লীর কৃষকসমাজ, তার রীতিনীতি, ধর্মবোধ, ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ, কোমলতা, কঠোরতা — সবকিছু যেন এই আখ্যান কাব্যে এক অপূর্ব রূপ পেয়েছে।

নক্‌সী কাঁথার মাঠ কাব্যের একাদশ অঙ্কে গাজনাচরের জমির অধিকার নিয়ে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পরিচয় পাই এবং এই দাঙ্গায় পল্লীর কৃষকের নির্বোধ সারল্যের কুফল হিসাবে জীবন-সংগ্রামের অপেক্ষাকৃত মৃদু চাপে সুখের নীড় তছনছ হয়ে যায়। দাঙ্গা হাঙ্গামার এই চিত্র আমাদের কাছে অতি প্রাচীন হলেও এই দাঙ্গা হাঙ্গামার পটভূমিতে কবি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থাকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গাজনাচরের ফসলের অধিকার আদায় করতে গিয়ে ছমির মিঞা, কাজেম খুনী, গদাই ভুঞা, রহম চাচা, রূপা মোড়ল ও জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজেদের অধিকারের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছে। *সোজন বাদিয়ার ঘাট*-এ হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান অভিন্ন সমাজ-পরিবেশে আন্তরিকভাবে ধরা পড়েছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির এই মানসিকতার ফলে কবি হিন্দুর মেয়ে এবং মুসলমান ছেলের প্রেমের মহিমাময় রূপটিকে সামাজিক সংস্কার ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে রেখে প্রেমের অপরিসীম অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে জয়ী করতে চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, মানবতার পূজারী। সোজন-দুলীর প্রেমলীলায় কবি যে সৌন্দর্য পরিবেশন করেছেন বাংলা সাহিত্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও তাঁর জোড়া খুব কমই মিলবে — অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে এ তো একান্তই দুর্লভ। দুলীর প্রেম-সাধনায় রয়েছে

যেন উমার তপস্যারই এক নতুনতর রূপ। এখানে পাত্র-পাত্রীর জাতি-ধর্মের পার্থক্য আমাদের চোখেই পড়ে না। প্রবল প্রেমের কাছে সামাজিক বাঁধা ধুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু *সোজন বাদিয়ার ঘাট*-এ হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত পল্লীর সমৃদ্ধিশালী কৃষকের জীবনে অনিবার্য বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার পটভূমিতে। প্রেমের অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে জয়ী করতে গিয়ে সমাজের শক্তির ক্রুর প্রতিক্রিয়ার কাছে পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছেন। কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "আমাদের ফরিদপুর অঞ্চলে বহু চাষী মুসলমান ও নমঃশূদ্রের বাস। তাদের মাঝে সামান্য সামান্য ঘটনা লইয়া প্রায়ই বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সব বিবাদে ধনী হিন্দু-মুসলমানেরা উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে সর্বনাশের পথে আগাইয়া দেয়। মহাজন ও জমিদারের মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই। শোষণকারীরা পৃথিবীতে সকলেই একজাতের। ইহাদের প্ররোচনায় হতভাগা নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের যে অবস্থা হয় তাহা চক্ষে দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এমনি একটি ঘটনা লইয়া এই পুস্তকের সূত্রপাত।"[৯] এ-উদ্ধৃতি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে সমকালীন যুগমানসের বিশেষ ধারায় জসীমউদ্‌দীনের কবিমানস গড়ে উঠেছে। তাই এসব কাব্যে শ্রেণী-সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সমাজচিত্র শ্রেণীসংগ্রাম ও যুগসচেতন শিল্পী হিসাবে অধিকতর উত্তরণ ঘটেছে। বস্তুতঃ *নক্‌সী কাঁথার মাঠ*-এ প্রেমভাবনাই মুখ্য কিন্তু *সোজন বাদিয়ার ঘাট*-এ প্রেমালেখ্য রচনার সাথে সাথে সমাজচিত্র অঙ্কনের প্রয়াসও লক্ষণীয়। *নক্‌সী কাঁথার মাঠ* কাব্যে গ্রাম্য সমাজকে লক্ষ্য করা গেলেও তা কাহিনীর আনুষঙ্গিক চিত্র মাত্র। কবির ভাবনার ক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়া নয়। জসীমউদ্‌দীন-মানসের বিপুল অভিজ্ঞতা যতটা *সোজন বাদিয়ার ঘাট*-এ লক্ষ্য করা গেছে *নক্‌সী কাঁথার মাঠ*-এ ঠিক ততটা নয়। কাব্য কাহিনী রচনায় *সোজন বাদিয়ার ঘাটে* কবিমানস ঔপন্যাসিকের বিস্তৃত মানসসীমা পরিক্রম করেছে। তবুও বলা যায় *নক্‌সী কাঁথার মাঠ* কাব্যে ঔপন্যাসিকের এই মনোভাব প্রকাশে খানিকটা অসঙ্গতি চোখে পড়লেও জসমিউদ্‌দীনের কবিপ্রতিভা তাতে তেমন ব্যাহত হয়নি।

১৯৩৭ সাল থেকে তাঁর কাব্যসাধনার প্রথম পর্বের অবসান হয়েছে। এর পরবর্তী কালে তিনি কাব্যসাধনায় বিচিত্র পথের সন্ধান খুঁজেছেন কিন্তু তাঁর কাব্য সাধনার প্রথম যুগের পল্লীনিষ্ঠ স্বভাবের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, আগস্ট বিপ্লব, দেশ বিভাগ এবং পারিপার্শ্বিক দেশ-কালের সমস্যায় কবির চিত্তে প্রবল দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে। তাঁর *বালুচর রূপবতী, মাটির কান্না* কাব্যে রবীন্দ্র-নজরুলের রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি প্রেমাকুলতা ও বলিষ্ঠ দুরন্ত ভাব বিহ্বলতার তরঙ্গে

উঠেছেন। আবার কোন কোন কবিতায় বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, মনন, যুক্তিধর্মিতা ও ভাষা ভঙ্গির প্রভাবে অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে। এই পর্বের মানসিকতার সঙ্গে তাঁর কবিসত্তার বিরোধ তীব্রতম হয়ে উঠেনি, কিন্তু সেই বিরোধ-ই অনিবার্য হয়ে উঠেছে *মাটির কান্না* কাব্যে। পল্লীবৃত্তের গণ্ডী অতিক্রমণের চেষ্টা এবং আধুনিক সত্তার আকালিক অভ্যুদয়ে তাঁর কবিসত্তা নিদারুণ অস্বস্তিবোধ করেছে।

এখানকার আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করলাম *রূপবতী, মাটির কান্না*- পর্বে একদিকে পল্লীজীবন, পল্লীসাহিত্য এবং পল্লীর ভাব-সম্পদকে পটভূমি হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন আবার আধুনিক যুগ- যন্ত্রণা, ভাবনা, হতাশা, বিশিষ্ট আধুনিক জীবনসমস্যা ঘোরতর দ্বন্দ্বের মধ্যে তাকে নিক্ষিপ্ত করেছে। ফলতঃ এই কালের কাব্যে জসীমউদ্‌দীনের পল্লীনিষ্ঠ স্বাভাবিক কবিসত্তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক দেশকালের প্রভাবে উদ্ভূত দুঃখ-দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাপীড়িত মেহনতি মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতিকার-কামনার জাগরণে তীব্র বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর বাংলায় সমকালীন যুগমানসে একটি বাস্তব জীবনাকূতিও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ফলে তিনি একটু অধিক মাত্রায় চিন্তাশীলতার জন্যে নানা বিষয়ে তাঁর মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠতে থাকে। একদিকে আপন স্বভাবের খাতে প্রবাহিত তাঁর স্বকীয় কবিসত্তা অন্যদিকে আধুনিক যুগ-জীবন- জিজ্ঞাসার প্রাখর্য এ-সমস্ত মিলে জসীমউদ্‌দীনের কবিমানস *রূপবতী, মাটির কান্না*- পর্বে একটি বিশেষ রূপ নিয়েছিল।

রূপবতী কাব্যের 'উষাবতী সেন', 'নিশীথ গীতিকা', *মাটির কান্না* কাব্যের 'হাসপাতাল', 'জাহানারার কবরে', 'খ্রীষ্ট', 'প্রাচ্য গুরু জামালউদ্‌দীন', 'নাজীর', 'নতুন কবিতা', 'বাস্তুত্যাগী', 'রোজার তারাবি', 'পাকিস্তান' ইত্যাদি কবিতায় এই চেতনার প্রক্ষেপ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই সত্তার জাগরণে তাঁর কবিমন নিদারুণ অস্বস্তিবোধ করেছে এবং এই দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়নি। দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কবির চিত্ত মানসিক সংকট অনুভব করে গভীর সংগ্রাম করেছে। পল্লীনিষ্ঠ ধ্যানধারণার গণ্ডী অতিক্রমণের চেষ্টায় সফলকাম না হতে পেরে কবিচিত্তে অবসাদ এসেছে। তাই *রূপবতী, মাটির কান্না*-র আধুনিক প্রয়াসের প্রায় এক দশক পরে *সকিনা* এবং তারও কিছু পরে *মা যে জননী কান্দে* (১৯৬১) পর্বে পুরনো খাতে কাহিনীকাব্যের দ্বারস্থ হয়ে আত্মবিস্মৃতির আনন্দে দ্বন্দ্ব-সংশয়ের গুরুভার ক্ষণিকের জন্য নামিয়ে রেখে আত্মস্থ হতে চেয়েছেন। *সকিনা*-তে কাহিনী কাব্যের সুর কিছুটা স্বচ্ছ হলেও *মা যে জননী কান্দে* -তে ততটুকু হয়নি। উপরন্তু এখানে "কাব্যের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পল্লীমানুষের নগরমুখী মিছিলের

চিত্রে এবং এখানে সেখানে তাঁর কাব্যে নাগরিক পারিপার্শ্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করি।"[১০]

কবি তাঁর ভাবনার পথপরিক্রমার মধ্য দিয়ে পরিণামী সমন্বয়ের রাজ্যে উপনীত হয়েও স্বস্তি পাননি, শান্তি পাননি! এখানে মনোধর্মে পরিবর্তিত কবি উন্মনা এবং পুরনো কাহিনীকাব্যের স্মৃতির রাজ্যে অবগাহন তন্ময়তা এবং এই আশ্রয়ে তিনি দ্বন্দ্বের হাত থেকে পরিত্রাণ প্রয়াসে উদগ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

হলুদবরণী (১৯৬৬), *জলের লেখন* (১৯৬৯)–এ তিনি আপন বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত *ভয়াবহ সেই দিনগুলি*তে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের দিনগুলোর পাকিস্তানের অমানুষিক অত্যাচারের চিত্র খণ্ড কবিতার মাধ্যমে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। স্বদেশ ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও জনজীবনের বিপর্যয় ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে প্রতিফলিত করেছেন। জসীমউদ্‌দীনের কাব্যসাধনার বিকাশ ও সমৃদ্ধি–পর্বে যন্ত্রযুগের প্রবর্তনায় পাশ্চাত্যের মত আমাদের দেশে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠলেও নগরের পাশাপাশি পল্লীর স্থান তখনও অনিবার্য ছিল। সে সময় জসীমউদ্‌দীন "কোন প্রতিক্রিয়ার মানস প্রাখর্য তাড়িত হয়ে পল্লী কবিতা রচনায় তিনি উদ্যত–লেখনী হন নি, দূরস্থিত স্মৃতিরোমন্থনের রোমান্টিকতায় তাঁকে উদ্বেলিত হতে হয়নি। একেবারেই বিষয়ের গভীর থেকে তিনি উঠে এসেছেন।"[১১] কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের জীবনকালেই তাঁর কাব্যসাধনার দু'তিন দশক বিগত হতেই জীবনপারিপার্শ্বিকতায় মৌল পরিবর্তন দেখা দিল। যন্ত্রযুগের ক্রমপ্রসারের মধ্য দিয়ে নগর জীবনের দ্রুত বিকাশ ঘটতে শুরু করল। কয়েক দশকের মধ্যেই দেখা গেল আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভারকেন্দ্র পল্লী থেকে নগরে সরে এল, পল্লী সব দিক থেকেই নগর–নির্ভর হয়ে পড়ল। ফলে কালক্রমে ঐশ্বর্যরিক্ত পল্লী আমাদের জীবনের নেপথ্যে চলে গেল, তার স্থান জুড়ে বসল নগর। স্বাভাবিক ভাবেই তাই বাংলা কাব্যের অঙ্গন থেকে পল্লী বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়েছেন পল্লীর রূপকার কবিরাও।[১২] জসীমউদ্‌দীনের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ *মা গো জ্বালায়ে রাখিস আলো* কাব্যে কবির অপরিসীম পল্লীপ্রীতি অতি করুণভাবে ঝরে পড়েছে :

ছাড়ি ঘরদোর ছাড়ি ছোট গ্রাম খানি,
অভাব তাদের শহরে আনিল টানি।
এখানে নিঠুর ইটপাথরের ঘর,
স্নেহ–মমতায় নাহি কারো অবসর।
('নির্বাসিতা', *মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো*)

আবার

তবু এই খানে দাঁড়ায়ে অভাগী মেয়ে,
কিছু কেঁদে লই তোর মুখ পানে চেয়ে।
এ দেশে কবির আঁখি জল ছাড়া আর,
আছে কি শকতি কিছু পারে করিবার?
তবু ওই মুখে আজো যেন পড়া যায়,
শিমুল ফুলের সেই রঙ কাঁদে হায়।
আম–কাঠালের ছায়া ঘেরা সেই বন,
আজো তোর তরে করিতেছে ক্রন্দন।
নির্বাসিতা এ সোনার বরণী সীতা,
কোন কবি নাই রচিবে যে তোর গীতা।

('নির্বাসিতা', *মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো*)

কি করিয়া কি হইল কার অভিশাপ পেয়ে,
হলুদ রাজার হলুদ দেশে দুঃখ এলো ধেয়ে।
রাজা গেল রাজ্য গেল সব হল ছারখার,
রাজপুরীতে বাতি দিতে কেউ নাহিক আর।
গল্প বলার সেই দাদিমা পালিয়ে গেছে কবে,
হয়না মুখর গাঁ খানি আর গাজীর গানের রবে।

('রাজার মেয়ে', *মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো*)

মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো কাব্যে পল্লী মায়ের উদ্দেশ্যে কবির প্রার্থনা—

তুই মাগো হেথা আঙিনার কোণে
শেষ প্রদীপটি ধরে,
যারা ঘরে ফিরে আসেনি আজিও
তাহাদের লাগি থাক প্রতীক্ষা করে।
যদি নিবে যায় মাটির প্রদীপ
আশার প্রদীপ নিবাস্‌নে অন্তরে;
যারা চলে গেছে হয়তো ফিরিবে,
আর কোন দিন আর কোন নিশিভোরে।

('মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো' নাম কবিতা)

তুলনীয়-

বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি যুঁই এর বনে
বিদায় নিল সজল চোখে নয়–বসরের ক'নে।
বিদায় নিল কাঁচপোকা টিপ, নয়নে কাজল,
নাকটি হ'তে নোলক মোতি, চরণ হ'তে মল।
বিদায় নিল লাল পেড়ে আধ ঘোমটাটি বধূর
সরল সভয় তরল চোখের চাউনি সুমধুর।
সুবাস ভরা টেকা খোঁপার চারু চিকন ছবি,
তাদের সাথে বিদায় নিল কবি ....
ধনপতি সাধুর পায়ের উদ্ধত দাপট
ভেঙে দিল খুল্লনা মা'র চণ্ডীপূজার ঘট।

ধানদূর্বার আশিষ গেল, মায়ের হাতের ফোঁটা,
হৃৎকমলের পাঁপড়ি ঝরে রইল শুধু বোঁটা।
যুগের হাওয়া বদলে গেল, নিভিয়ে দিল ঝড়
বঙ্গমাতার আঁচল আড়ের দীপটি মনোহর।
কবির যত পুঁজি পাটা বিদায় নিল সবি
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি। [১৩]

কোন কবির কাব্যবিচার এবং কবিমানস বিশ্লেষণে কবির ব্যক্তিজীবনের কাহিনীকে সম্পূর্ণ রূপে বাদ দেওয়া যায় না। কবির ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবন স্বতন্ত্রধারায় প্রবাহিত নয়। কবির কাব্য সৃষ্টিকালে কবিজীবন প্রাধান্য বিস্তার করে কিন্তু ব্যক্তিজীবনের ছায়াও অবচেতনে ক্রিয়াশীল। আমাদের বক্তব্য একথাই প্রমাণ করেনা কবির ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি কথাই তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হবে — তবে কবিজীবনের বিভিন্ন ধাপের সূক্ষ্ম আলোচনায় কবি-মানসের স্বরূপ সন্ধানে কিছু সঠিক তথ্যের সন্ধান পেতে পারি। এ-উক্তি থেকে আমরা এ-সিদ্ধান্তে আসতে পারি জসীমউদ্‌দীনের কবি-মানস ও কাব্যের আলোচনায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসও স্মরণের প্রয়োজন আছে।

জসীমউদ্‌দীনের প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস এখনও রচিত হয়নি। তবে ভ্রমণকাহিনী ও জীবনস্মৃতি আকারে রচিত কবির গদ্য রচনা যেমন, *যাঁদের দেখেছি* (১৯৫২), *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়* (১৯৬০), *চলে মুসাফির* (১৯৫৭), *জীবন কথা* (১৯৬৪), *হলদে পরীর দেশে* (১৯৬৫), *সে দেশে মানুষ বড়* (১৯৬৮), *স্মৃতির পট* (১৯৬৮), *জার্মানীর শহরে বন্দরে* (১৯৭৫) এগুলিতে কবির জীবনের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত *জীবনকথা* নামক গ্রন্থে কবি নিজেই তাঁর জীবনের একটা বিরাট অংশের কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। *জীবন কথা, যাঁদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়, স্মৃতির পট, স্মরণের সরণী বাহি* (১৯৭৮) বইগুলিই এ- প্রসঙ্গে বেশী মূল্যবান। এছাড়া তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ও পরে বিভিন্ন সাহিত্যিডকর প্রদত্ত জসীমউদ্‌দীনের সংক্ষিপ্ত জীবনতথ্য, কবির পরিচিত বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের মুখে নানা তথ্য সংগ্রহ করে এবং কবিপ্রদত্ত দু'একটি সাক্ষাৎকার[১৪] অবলম্বন করে আমরা জসীমউদ্‌দীনের জীবনী সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করছি।

ফরিদপুর জেলার তাম্বুল খানা গ্রামে ১৯০৪ সালের ১লা জানুয়ারী মামা বাড়ীতে কবি জসীমউদ্‌দীনের জন্ম। কবির নিজগ্রাম গবিন্দপুর হতে তাম্বুলখানা ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। নদীর তীরেই ছিল জসীমউদ্‌দীনের বাড়ী। এ-বাড়ীতেই কবির ছেলেবেলা কেটেছে। বাড়ীর পাশেই নদীতে ভিন গাঁয়ের মাঝি-মাল্লারা সুরেলা কন্ঠের গান গেয়ে নৌকা বেয়ে যেত। এ নদীটি শীতকালে শুকিয়ে যেত আর বর্ষাকালে পানিতে টুব টুব করতো। মাঘ মাসে ঘরের পাশে কুল পেকেউঠতো।

শীতের শেষরাতে গাছ থেকে কুল পড়ার শব্দে জসীমউদ্‌দীনের ঘুম ভেঙে যেত। বাড়ীর উত্তর দিক ছিল ঘন জঙ্গল-আচ্ছাদিত। এখানে বিচেকলার বাগান ছিল। মৃদু বাতাসে কলাগাছের পাতায় শব্দ হতো সেই শব্দে বালক জসীমউদ্‌দীনের মন আনন্দে উদাস হতো।

কবির পিতার নাম মৌলভী আনসারউদ্‌দীন। জসীমউদ্‌দীনের পরদাদার নাম ছিল আরধিন মোল্লা। আরাধন মোল্লা গ্রাম দেশের প্রসিদ্ধ জোতদার ছিলেন। আরাধন মোল্লার মৃত্যুর পর পদ্মা নদীতে তার জমি-জমা বাড়ীঘর সব ভেসে যায়। কলিমুদ্দীন মোল্লা, ছমির উদ্দীন মোল্লা, আর দানু মোল্লা অন্যত্র গিয়ে বাড়ী করেন। ছমির উদ্দীন মোল্লা কবির আপন দাদা। মৌলভী আনসার উদ্দীন তার একমাত্র পুত্র। [১৫]

জসীমউদ্‌দীনের পিতা ফরিদপুর হিতৈষী এম. ই. স্কুল নামে একটি স্কুল নিজ হাতে গড়ে তোলেন। এই স্কুলে প্রায় ৩৫ বৎসর শিক্ষকতা করেন। এ-স্কুলটিতে শিক্ষকতা করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। পারিশ্রমিক হিসেবে মাসে মাত্র পনেরো টাকা পেতেন। জীবনের সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর ব্যক্তিগত নানা অভাব-অভিযোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে এই স্কুলটিকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এত স্বল্পবেতনে সংসার মাঝে মাঝে অচল হয়ে পড়তো কিন্তু তবু স্কুল ছেড়ে দিয়ে অন্য চাকুরী নেয়ার কথা তিনি কখনও ভাবেন নি। তাঁর পৈত্রিক কয়েক বিঘা মাত্র জমি-জমা ছিল তা ভাগে চাষ করে অর্ধেক ফসলে বৎসরের আট নয় মাসের খোরাক হতো। স্কুলের কাজ ছাড়া বিবাহ পড়ান, মৃতের জানাজা দিয়ে, মহাজনের খত ও নৌকার চালান লিখে দিয়ে কবির পিতার সামান্য আয় হতো। জসীমউদ্‌দীনের পিতা সংসার সম্পর্কে খুবই উদাসীন ছিলেন এবং তাঁর আয় নিতান্ত স্বল্প হওয়ায় সংসারের অবস্থাও খুব অস্বচ্ছল ছিল। তথাপি তিনি ছিলেন সরল এবং অতিথিবৎসল। অতিথি-জনকে আদর আপ্যায়ন করতে তিনি ছিলেন একান্তই আন্তরিক। সংসার সম্পর্কে গভীর ঔদাসীন্য জসীমউদ্‌দীনের চরিত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিক্ষকতা তাঁর পেশা হলেও তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর খুব দখল ছিল। কবির পিতা আর একটি কারণেও স্থানীয় সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ওহাবী আন্দোলনের প্রতিভূ হাজী শরিয়তুল্লাহর জামাতের প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর চরিত্রের আরও গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। কবির পিতা আদর্শবাদী মহান লোক ছিলেন।

কবির মাতার নাম মোসাম্মাৎ আমিনা খাতুন। তিনি ছিলেন সরলা স্নেহময়ী পল্লীজননী। সংসারে তার অভাব-অনটনের সীমা পরিসীমা ছিল না। তবু তিনি ছিলেন সদানন্দ মহিলা। অভাবের সংসারে তিনি কোনদিন নিরানন্দ হননি। এই স্নেহময়ী মায়ের প্রভাবে কবি হৃদয় স্নাত ও অভিষিক্ত হয়েছিল। [১৬]

এ–কথা আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট যে জসীমউদ্‌দীন পল্লীর নিভৃত কোলেই মানুষ। পদ্মার তীরেই তাঁর সেই আপন গ্রাম গবিন্দপুর। কবির আপনার বাড়ীর উঠানে তাঁর সেই দাদীর কবর। কবরের উপর রয়েছে একটি ডালিম গাছ। কিন্তু সে ডালিম গাছ 'কবর' কবিতার ডালিম গাছ নয়। নতুন করে লাগানো হয়েছে এটি। কিন্তু এর পাশে দাঁড়ালে সামনে পড়ে পদ্মার চর। অনেক দূর দৃষ্টি দিলে চোখে পড়ে ফুলে ফুলে ভরা কাশবন। আর ধান কলাইয়ের মৌসুমে কলাই খেতের পাশের সরিষা খেতের সৌন্দর্য। এ সবের বুকেই জড়িয়ে ছিলেন কবি। শৈশব, কৈশোর, যৌবন এমনকি প্রৌঢ় জীবনেরও অনেক সময়। সে কথাই কবিবন্ধু শরপ উল্ল্যার বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, "বাড়ীর সামনে চরের মধ্যে যখন হলুদে হলুদে হয়ে সরিষা খেত ভরে উঠতো, তখন কবি তার মাঝে গিয়ে প্রায়ই বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে কি ভেবে যেন কেঁদে আকুল হতেন আর কি কি যেন লিখতেন।"[১৭] তিনি আরও উল্লেখ করেন, "এই যে পাশ দিয়ে রেল লাইন চলে যেতে দেখেছেন, এর ছোট ছোট খাদ দেখছেন, এগুলোতে কবি নিজেই অনেক সময় মাছ ধরতেন। অনেক সময় কবি সাব আমাদের সাথে কলুই সীম পুড়ে পুড়ে খেয়েছেন। আমরা সবাই আনন্দ করেছি। তখনকার দিনে কত যে মটর শুটীর গাছ হতো তার কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।"[১৮]

জসীমউদ্‌দীন বাস্তব থেকেই নিয়েছেন তাঁর কবিতার সার। এই মানসিকতা আর এই কথাগুলিই তাঁর কবিতায় বাঁধা পড়েছে। কবি নিজেই সেকথা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর জীবনকথায় লিখেছেন এর অনেক আগেই :

শীতের দিন সকাল হইলে আমি আর নেহা নদীর ওপারে চলিয়া যাইতাম। সেখানে সরষে খেতের পর সরষে খেত চলিয়া গিয়াছে। ফোঁটা–ফোঁটা হলদে সরষে ফুলের গাছগুলি একের সঙ্গে অপরে মেশামেশি হইয়া দূরের গ্রামে মেশা আল্লার আসমান তক যাইয়া ঠেকিয়াছে। গন্ধে–বাতাস তেলেসমাত। আমরা সেই খেতের মধ্যে যাইয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতাম। সরষে গাছের গোড়া জড়াইয়া আছে দুধালী লতায়। সাদা সাদা সুন্দর ফুল। সেই লতা কুড়াইয়া মাথায় জড়াইতাম। তারই তলায় আস্তে আস্তে পাতা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে মটরশুঁটি আর খেসারী গাছ। এখনও সীম হয় নাই। মটরশুঁটির সাদা গোলাপী মেশা পারের উপরে সুন্দর লালের ফোঁটা। গ্রাম্য মেয়ের নোলকের মত। আর খেসারী ফুলগুলি নীল। আমরা ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কানে গুঁজিতাম। তারপর চষাক্ষেত হইতে শামুক কুড়াইয়া কুড়াইয়া তাহা ছিদ্র করিয়া মালা গাঁথিতাম। সেই মালা একটি গলায় পরিতাম আর একটি মাজায় জড়াইতাম। তারপর দুই ভাই চষা খেতের মধ্য দিয়া দিতাম দৌড়। কে আগে যাইতে পারে। আমাদের গলায় শামুকের মালার শব্দে সমস্ত চর ঝম ঝম করিয়া বাজিয়া উঠিত। এই ভাবে ভর দুপুর খেলিয়া বাড়ি ফিরিতাম। অত বেলায় বাড়ি ফিরিলে মা যদি বকে সেই জন্যে রাশি রাশি মটরের শাক, সরষে শাক কুড়াইয়া লইয়া আসিতাম। চরে যখন মটরশুঁটির খেতে আর খেসারী কলায়ের খেতে সীম ফলিত তখন আর আমাদের পায় কে! সকালে সামান্য কিছু খাইয়া চরে যাইতাম। আর সারাদিন সেখানে কাটাইতাম। মটরের সীম খেসা–

রীর সীম, খাইয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতাম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাঁড়ি লইয়া গিয়া সীমগুলি নাড়ার আগুনে সিদ্ধ করিয়া চাষীদিগকে নিমন্ত্রণে ডাকিতাম। শহরে যাইয়া যে সব দালান কোঠা দেখিয়াছি তারই অনুকরণে মাঝে মাঝে আমরা মাঠের ঢেলা কুড়াইয়া নকল দালান গড়িতাম। তার অনেকগুলি কুঠরী থাকিত। সেই দালানের মধ্যে মাঠের শুকনো নাড়া পুরিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিতাম। আগুনের তাপে দালানের রঙ ইটের মত হইত। সেই দালানে কতক রাজপুত্র রাজকন্যাকে আনিয়া বসাইতাম। এই ভাবে খেলিয়া দিন শেষ হইত। সারাদিন চরে কাটাইয়াছি। মা যে বকিবেন এ কথা তখন মনে হইত। চর হইতে যত শুকনো ঘুটো কুড়াইয়া লাল আলোয়ানে বাঁধিয়া চাষীদের ডিঙি নৌকায় সোয়ার হইয়া বাড়ি ফিরিতাম। মা খুব বকিতেন কিন্তু আলোয়ান খুলিয়া যখন শুকনো ঘুটোগুলি দেখাইতাম মায়ের মুখে একটু মৃদু খুশী দেখা যাইত। [১৯]

ছন্দে মিলিয়ে এ দিক সেদিক ঘুরিয়ে এ কথা গুলিই যেন পরবর্তীকালে কবিতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন,

তুমি যদি যাও আমাদের গাঁয়ে, তোমারে সঙ্গে করি,
নদীর ওপারে চলে যাই তবে লইয়া ঘাটের তরী।
মাঠের যত না রাখাল ডাকিয়া
তব সনে দেই মিতালী করিয়া
ঢেলা কুড়াইয়া গড়ি ইমারত সারা দিনমান ধরি,
সত্যিকারের নগর ভুলিয়া নকল নগর গড়ি।

তুমি যদি যাও— দেখিবে সেখানে মটর লতার সনে,
সীম-আর সীম—হাত বাড়াইলে মুঠি ভরে সেইখনে।
তুমি যদি যাও সে সব কুড়ায়ে
নাড়ার আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে,
খাব আর যত গেঁয়ো চাষীদের ডাকিয়া নিমন্ত্রণে
হাসিয়া হাসিয়া মুঠি মুঠি তাহা বিলাইব দুই জনে।

তুমি যদি যাও—শামুক কুড়ায়ে, খুব—খুব বড় করে,
এমন একটি গাঁথিব মালা যা দেখনি কাহারো করে,
কারেও দেবনা, তুমি যদি চাও
আচ্ছা না হয় দিয়ে দেব তাও,
মালাটিরে তুমি রাখিও কিন্তু শক্ত করিয়া ধরে,
ও পাড়ার সব দুষ্ট ছেলেরা নিতে পারে জোর করে।

সন্ধ্যা হইলে ঘরে ফিরে যাব, মা যদি বকিতে চায়,
মতলব কিছু আঁটিব যাহাতে খুশী তারে করা যায়।
লাল আলোয়ানে ঘুঁটে কুড়াইয়া,
বেঁধে নিয়ে যাব মাথায় করিয়া,
এত ঘুষ পেয়ে যদি বা তাহার মন না উঠিতে চায়
বলিব— কালকে মটরের শাক এনে দেব বহু তায়।

খুব ভোর করে উঠিতে হইবে, সূর্য্যি উঠারও আগে
কারেও কবিনা, দেখিস্ পায়ের শব্দে কেহ না জাগে।

রেল সড়কের ছোট খাদ ভরে
ডানকিনে মাছ কিল্ বিল্ করে;
কাদার বাঁধাল গাঁথি মাঝামাঝি জল সেচে আগে ভাগে,
সব মাছগুলো কুড়ায়ে আনিব কাহারো জানার আগে।
("নিমন্ত্রণ", *ধানখেত*)

জসীমউদ্‌দীন বালক বয়সে খুবই চঞ্চল ছিলেন। কবির চাচাতো ভাই নেহাজউদ্‌দীন ছিলেন তাঁর সমবয়সী। দুজনের মধ্যে ছিল গলাগলি ভাব। বাড়ীর কাছেই ছিল গভীর জঙ্গল। জঙ্গল থেকে পাখীর বাসা, নানারকমের ফল, সজারুর কাঁটা জোগাড় করা ছিল এই দুজনের কাছে খুব বড় কাজ। খেলাধূলা, হৈ হৈ করা— এসবে একটু বেশী মেতে ছিলেন। যার ফলে ছেলেবেলায় জসীমউদ্‌দীনকে স্কুলে পাঠাতে তাঁর পিতাকে বড়ই বেগ পেতে হয়েছিল। সমবয়সী ছেলেরা স্কুল নিয়ে নানারকম গল্প করেছে বালক জসীমউদ্‌দীনের কাছে। তাই স্কুলের মাস্টারের নানারকম শাস্তি সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের মনে প্রথমত প্রবল ভীতি ছিল। ভোর না হতেই জসীমউদ্‌দীন আর তাঁর চাচাতো ভাই নেহাজউদ্‌দীন বাড়ী হতে পালিয়ে গিয়ে আজ আঁখের ক্ষেত, কাল শরষে ক্ষেতে গিয়ে পালিয়ে থাকতেন। শেষে একদিন তাঁর বাবা শরষে ক্ষেত হতে জসীমউদ্‌দীন আর নেহাজউদ্‌দীনকে ধরে স্কুলে নিয়ে গেলেন। শোভারামপুরের আম্বিকা মাষ্টারের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি।[২০]

কবির পিতার বন্ধু ছিলেন জোয়াইড় গ্রামের মনসুর মৌলবী। ইনি আরবী-ফারসী শিক্ষায় পারদর্শী ছিলেন। কবির মানসপ্রকৃতির উন্মেষের প্রথম জীবনে এই মৌলবী সাহেবের চরিত্র ও তন্নিহিত আদর্শ প্রভাব ফেলেছিল ; যার ফলে পরবর্তী কালেও আর দশজনের মত আমাদের আলেম সমাজকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন নি।[২১] পাঠশালায় যাবার আগে দল বেঁধে নদীতে সাঁতার কাটতে যেতেন কবি। পাঠশলা, গ্রাম, নানাধরনের খেলা খেলতে দিন কাটতো তাঁর।[২২] দানু মোল্লা নামে কবির পিতার এক চাচাতো ভাই ছিলেন। ছোট বেলায় চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি পড়ালেখা করতে পারেন নি। কেচ্ছা, শ্লোক, রূপকথার গল্প, গ্রাম্য গান এবং সুরে তিনি ছিলেন গ্রাম বাংলার কৃষ্টির জীবন্ত প্রতীক। পাঠশালার পড়া হয়ে গেলে কবি দাদার কাছে যেতেন কেচ্ছা শুনতে। ফুট ফুটে জোছনা রাতে উঠোনে মাদুর বিছিয়ে কবি কেচ্ছা শুনতেন। জসীমউদ্‌দীনের কবিজীবনের প্রথম উন্মেষ হয়েছিল তাঁর এই দাদার গল্প গান ও কাহিনীর ভিতর দিয়ে।[২৩]

গাঙের ওপারে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে শোভারামপুরের অম্বিকা মাস্টারের পাঠ-শালায় যাওয়া বালক জসীমউদ্‌দীনের পক্ষে সম্ভব ছিল না; তাই তার পিতা হিতৈষী

স্কুলে যেখানে শিক্ষকতা করতে সেখানে এনে ভর্তি করালেন। বাল্যকালে তাঁর স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরের পুস্তক পড়ার, কবিতা আবৃত্তি করার আগ্রহ ছিল তাঁর খুব বেশি। সাহিত্যানুরাগী পিতার বটতলার দোভাষী পুঁথি এবং কিছু পাঠ্য বই মাত্র ছিল। এই দোভাষী পুঁথিগুলি তিনি গোপনে পড়ে ফেলতেন। জসীমউদ্‌দীন হিতৈষী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলে এস. ডি. ও. বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের ছেলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব ঘটেছিল। মনোরঞ্জনের বাড়ীতে ছোটদের পড়বার মত অনেক বই ছিল। তাদের বৈঠকখানায় বসে দুই বন্ধুতে সেই বইগুলি পড়তেন এবং বড় হয়ে সুন্দর সুন্দর বই লেখার ভবিষ্যৎ জল্পনা-কল্পনায় আত্মহারা হতেন। তাঁর শিল্পীসত্তার উন্মেষ ও বিকাশে এ-সময়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২৪] যখন তাঁর বয়স সাত আট বৎসর তখন কবিগান তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। পার্শ্ববর্তী পাড়ায় তখন যেখানেই কবিগানের সংবাদ পেয়েছেন সেখানেই যেতের্ন। কবিগান শুধু শোনাই নয়, প্রাণপণে কবিগান আয়ত্তও করেছিলেন। এবং যেই কবিগান গাইতে পারতেন তাকে সঙ্গে নিয়ে পালা করতেন। এই ভাবে নানা কবিগানের আসরে গিয়ে নানা সুরের ধূয়ার সঙ্গে পদযোজনা করে তিনি নানা ছন্দের ছড়া রচনার অভ্যাস করলেন। এ-সমস্ত সুরের মধ্যে যেগুলি গীতিধর্মী সেগুলিও তাঁর মুখস্ত ছিল। আমদের দেশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কবিয়ালদের ঋণের কথা আলোকপাত করে *জীবন কথায়* অকপটে স্বীকার করেছেন। তারা তাঁর শিল্পীসত্তার উন্মেষ ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২৫]

জসীমউদ্‌দীন ফরিদপুর হিতৈষী স্কুলে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত অতিবাহিত করেন এবং এই বিদ্যালয় জীবনে জসীমউদ্‌দীনের বাইরের পুস্তক পড়ার আগ্রহ ছাড়াও আরও দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। একটি কবিগানের রসনৈপুণ্য এবং অপরটি কাঁচা হাতের কবিতা লেখার উৎসাহ। এর পূর্বে তিনি সুরের সঙ্গে পদ রচনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সুর না করে শুধু কথার ছন্দে পদ রচনা করতে পারতেন না। সুরের সঙ্গে রচিত পদ, কথার ছন্দে রচিত পদের সঙ্গে এক করে কবিতা লিখতে শুরু করলেন। এবং অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু ছিল সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক। ক্লাসের সহপাঠী বন্ধুদের এগুলি পড়ে শোনাতেন। কিন্তু বন্ধুরা একটুও অবাক হয়না, এমনকি জসীমউদ্‌দীনের এ-লেখাগুলোকে এতটুকুও পাত্তা দেয়না। বরং নানা কথা বলে টিটকারী দিয়ে যায়। সেজন্য জসীমউদ্‌দীনের মন ভেঙে যায় কিন্তু উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি ক্ষিরোদ বাবুর অনুপ্রেরণায়। কখনও কখনও তাঁর কবিজীবনের দ্বিতীয় কবি গুরু ক্ষিরোদবাবুকে[২৬] পড়ে শোনাতেন। ক্ষিরোদ বাবু জসীমউদ্‌দীনের কবিতাগুলো পড়ে খুবই তারিফ করতেন। জসীম উদ্দীনের মাত্রা এবং ছন্দ জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে তিনি বিস্মিত হতেন। এ সব কিছুই ভাবী কবিজীবনের সুস্পষ্ট সঙ্কেত।

জসীমউদ্‌দীন যখন চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছেন এ-সময় বাড়ীর কাছে শ্মশান ঘাটে আগত এক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে সন্ন্যাসচিন্তায় প্রভাবিত হন এবং নিয়মিত যোগ এবং সংযম সাধনা শুরু করেন। এ জন্য অল্প সময়ের মধ্যে তিনি স্থানীয় হিন্দু সমাজে জসীম সাধু নামে পরিচিত হন।

হিতৈষী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলে জসীমউদ্‌দীনের পিতা তাকে ফরিদপুর জিলা স্কুলে ভর্তি করালেন। এই জিলা স্কুলের সহপাঠীগণের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় সরকারী উকিল শ্রীশ বাবুর পুত্র ধীরেন্দ্র। এদের পরিবারের সকলের থেকে জসীমদ্‌দীন যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন তা উল্লেখ না করলে কবির জীবনকাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। *জীবনকথা*'য় এ-সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন কবি।[২৭] ধীরেনদের বাসায় থাকাকালীন মনীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্নেহ স্পর্শে আসেন এবং কবির সঙ্গে তাঁর সাহিত্যসাধনা, অনেক উৎসাহের সঙ্গে চলে। দুজনে মিলে *ঊষা* নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেন। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় জসীমউদ্‌দীনের একটি কবিতা[২৮] স্থান পেয়েছিল। পরে বিভিন্ন কারণবশতঃ পত্রিকাটি ছাপানো সম্ভব হয়নি।

এ-সময়ে জসীমউদ্‌দীন ফরিদপুর সেবা সমিতির সভ্য হন এবং শহরের বহু বাড়ীতে অনেক রোগীর সেবা করতে শুরু করেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রভাবে কবি একসময়ে ভাবতেন যে তিনি বড় হয়ে সাধু সন্ন্যাসী হবেন। অবশিষ্ট জীবন পরের সেবায় আর উপকার করে কাটাবেন। কবি-সাহিত্যিক হবার তেমন উচ্চ আশা মনে প্রকট হয়নি।

কবি যখন নবম শ্রেণীতে উঠেছেন তখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল তোড়-জোড় চলছিল। ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। জসীমউদ্‌দীনও স্কুল ছেড়ে দূর সম্পর্কের কোন এক বোনের বাসায় চলে যান এবং কিছুদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে *দৈনিক নায়ক* পত্রিকা বিক্রি করেন। কিন্তু কলকাতার পরিবেশ এবং দারিদ্র্যের চাপে তাঁর স্বদেশীর খেয়াল স্তিমিত হয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয় যে স্বাদেশিকতার খেয়ালে ইংরেজের স্কুল ছেড়ে ছিলেন কিন্তু নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ের সংকীর্ণতায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং ঘরে ফেরার তাগিদ অনুভব করেন। এ-সময়ে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*'র সম্পাদক মোজাম্মেল হক সাহেবের (১৮৮৩-১৯৭৬) সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর পরামর্শে কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হন। কবির ব্যক্তিত্ব, স্নেহ আর মধুর ব্যবহারে জসীম-উদ্‌দীনের ধ্যানলোকের অনেক সাহিত্যিকদের দুর্ব্যবহারের আঘাত অনেকটা

প্রশমিত হয়।[২৯] কবি আবার ফরিদপুর ফিরে আসেন এবং পড়ালেখা শুরু করেন। জসীমউদ্‌দীন তাঁর কবিতার নকল নজরুলকে পাঠান। নজরুলের উৎসাহ জসীমউদ্‌দীনের মানসগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৩০] এর কিছুদিন পর *মোসলেম ভারত* পত্রিকার যে সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়, সে সংখ্যায় জসীমউদ্‌দীনেরও একটি কবিতা ছাপা হয়।[৩১] নজরুলের প্রচেষ্টায় এ–সময় চট্টগ্রাম থেকে *সাধনা* পত্রিকাতেও দু'তিনটি কবিতা ছাপা হয়।[৩২] ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে কিছুদিন অসহযোগীদের সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান ও তিলক স্বরাজ্য ফান্ডের চাঁদা তোলেন। তারপর ফরিদপুরের তদানীন্তন এস. ডি. ও. অক্ষয়কুমার সেন–এর পরামর্শে আবার পড়াশুনা শুরু করেন এবং মাত্র ২০/২৫ দিন পড়ে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হন ১৯২১ সালে। এ সময় জসীমউদ্‌দীনের একটি কবিতা *প্রবাসী'*–তে প্রকাশিত হয়।[৩৩] এই কবিতাটি অনেককেই মোহিত করে। এর পরে *ভারতী*–তে জসীমউদ্‌দীনের পল্লীগান সংগ্রহ ও মনসুরউদ্দীনের পল্লীগান একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। *প্রবাসী* পত্রিকার একই সংখ্যায় জসীমউদ্‌দীনের ও মনসুর উদ্দীনের বাউল গান সংগ্রহ প্রকাশিত হয়।[৩৪] স্বদেশীর খেয়াল তখনও মাথা থেকে দূর হয়নি। কংগ্রেস অফিসের সাময়িক স্বেচ্ছাসেবক হয়ে তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে করতে কবি কলিকাতা এসে উপস্থিত হন। স্বদেশীয়ানা থেকে নজরুলের উৎসাহ এবং সহযোগিতা লাভই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। ব্যস্ত নজরুল কর্তৃক অবহেলিত কবি ভীষণ আশাহত হয়ে পড়েন। কিন্তু পরদিন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সহযোগিতায় জসীমউদ্‌দীন দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬–১৯৩৯) সঙ্গে পরিচিত হন।[৩৫] জসীমউদ্‌দীনের কিছু গ্রাম্য গান সংগ্রহ দেখে দীনেশচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন।

> যে খাতা খানায় গ্রাম্য গান সংগ্রহ করিয়াছিলাম সেই খাতা খানার কয়েকটি পাতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার সেই খাতায় মনোনিবেশ করিলেন। তারপর আবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আমার সকল অন্তর কম্পিত হইতেছিল। এই সেই ডাঃ সেন, যাঁহার ''বঙ্গভাষা , সাহিত্য'' রাত জাগিয়া জাগিয়া পড়িয়াছি, পদ্মার তীরে কত গভীর রজনীতে যাঁর বই পড়িয়া, দারিদ্র্যের কাহিনী জানিয়া নিজের জীবনকে এক উচ্চতর আদর্শে গড়িয়া লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমার সকল অন্তর সালাম হইয়া যেন তাঁহার সামনে লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল। আমি যেন এক গ্রহ হইতে আর এক নতুন গ্রহচক্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।[৩৬]

এরপর দীনেশচন্দ্র সেন তাকে ৭০ টাকা বেতনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাম্য গাঁথা সংগ্রাহক হিসাবে নিয়োগ করেন।[৩৭] দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে এই পরিচয় জসীউদ্‌দীনের ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তার উত্তরণে এক নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ

করেছিল। *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়, স্মরণের সরণী বাহী* প্রভৃতি পুস্তকে তিনি অত্যন্ত দরদ দিয়ে তা উল্লেখ করেছেন।

এরপর আট মাস পর গ্রাম্য-গান সংগ্রহ বিষয়ে পরামর্শ নেয়ার জন্য জসীমউদ্‌দীন কলিকাতা আসেন এবং দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। সেদিন একজন তরুণ কবির কবিতা *ভারতী* পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করছেন দীনেশচন্দ্র সেন। এই দেখে জসীমউদ্‌দীনও তাঁর স্বরচিত কবিতার খাতাটি দীনেশচন্দ্র সেনকে দেখতে অনুরোধ করেন। ডঃ সেন খাতাটি দেখতে অস্বীকার করেন। মোট কথা যে এ-সময় তিনি জসীমউদ্‌দীনকে শুধু পল্লীগীতি সংগ্রাহক রূপেই ধরে নিয়েছিলেন।[৩৮]

কল্লোল পত্রিকা ফরিদপুরে বিক্রয় করার কাজে জসীমউদ্‌দীন *কল্লোল* কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতেন। এই সুত্রে জসীমউদ্‌দীন *কল্লোল* কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন এ সময়েই বিখ্যাত 'কবর' কবিতা রচিত।[৩৯] সেই কবিতা *কল্লোল*-এ পাঠালেন। প্রায় ছয়মাস পর কবিতাটি কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক পিছনের দিকে ছোট অক্ষরে ছাপালেন।[৪০]

জসীমউদ্‌দীনের অনুরোধে দীনেশচন্দ্র সেন *কল্লোল*-এ প্রকাশিত কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হন। তিনি জসীমদ্‌দীনের কাছে চিঠিতে প্রশস্তি লিখলেনঃ "দূরাগত রাখালের বংশী ধ্বনির মত তোমার কবিতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।"[৪১] মাস খানেক পড়েই তিলক সংখ্যা *ফরওয়ার্ড* পত্রিকায় 'কবর' কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে An young Mohammedan poet নামে জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেন।[৪২] এতে মুসলমান কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলামের কবি কৃতিত্বের পর জসীমউদ্‌দীনের স্থান নির্দেশ করেছেন। এ-প্রবন্ধ বের হওয়ার পর দেশের বড় বড় মাসিক পত্রিকা থেকে কবিতা পাঠাবার আমন্ত্রণ পান। এর পর থেকে কবিতা ছাপাতে জসীমউদ্‌দীনকে আর কোন বেগ পেতে হয়নি।[৪৩] ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকেই তৃতীয় বিভাগে আই. এ. পাশ করেন ১৯২৪ সালে। জসীমউদ্‌দীন বি. এ. ক্লাসে পড়বার সময় দীনেশচন্দ্র সেন 'কবর' কবিতাটি ম্যাট্রিক সিলেকসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। দীনেশ বাবু জসীমউদ্‌দীনকে লিখেছিলেন "তোমার কবিতাটি ম্যাট্রিক ক্লাসে পাঠ্য হয়েছে। তোমার ছাত্রাবস্থাই তোমার কবিতার আদর হ'ল, বাংলাদেশের আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই।"[৪৪]

বি. এ. পরীক্ষার পূর্বেই কবির *রাখালী* (১৯২৭) প্রকশিত হয়। এর পর দীনেশ বাবুর আনুকূল্যে *নক্‌সী কাঁথার মাঠ* (১৯২৯) কাব্য প্রকাশিত হয়। *নক্‌সী কাঁথার মাঠ* সম্পর্কে তিনি ৮/৯ পৃষ্ঠা সমালোচনা প্রকাশ করেন।[৪৫] *সোজন বাদিয়ার*

ঘাট প্রকাশিত হলে 'সাহিত্য সেবক সংঘের একটি অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি এই বই সম্পর্কে ১৬/১৭ পৃষ্ঠা সমালোচনা করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, "আমি হিন্দু। আমার নিকট বেদ পবিত্র, গীতা পবিত্র, কিন্তু সোজন বাদিয়ার ঘাট পুস্তক তাহার চাইতেও পবিত্র। কারণ ইহাতে আমার বাংলাদেশের মাটির মানুষগুলির কথা আছে। আমার গ্রামগুলির বর্ণনা আছে।"[৪৬] দীনেশ চন্দ্রের এই উক্তি অত্যন্ত সত্য। সুখে-দুঃখে-সংগ্রামে-শান্তিতে জাগ্রত বাংলার মর্মমূলে স্বপ্নাতুর পাখির মত তিনি বারম্বার অবগাহন করেছেন এবং তাঁর হাতে তাই অনায়াসে নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের কবিতা। দুই পাশের মানুষের ছবি আঁকতে কবি এগিয়ে গিয়েছেন প্রায় বহতা নদীর মত সঙ্গে নিয়ে তাঁর পাঠককে। অকৃত্রিম মাটির মানুষই বিষয় হিসাবে তাঁর কবিতায় এসেছে ঘুরে ফিরে। কবি-বাড়ীর সামনে দিয়ে বিস্তীর্ণ পদ্মার চরে জমি নিয়ে প্রায়ই হত 'কাইজা'। অম্বিকাপুরের ভাটিতে নমু ডাঙ্গা। সেখানে নমুরা এখনো আছে। এদের রামদার তীক্ষ্ণতা এখনো প্রকাশ পায়। মাধবদিয়াতেও নমুরা বাস করতো। তবে এখানকার নমুরা ১৯৫০-৫৪ সালে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু আজিরাবাদ, ডাংগী, টপুরকা নদী, বালুধুব ইত্যাদি অঞ্চলে এরা এখনো বাস করে। এদের ইতিহাস ও জীবনপদ্ধতি জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় বাস্তবতা পেয়েছে—

এমন সময় একটা কিছু সামান্য কি কারণ লয়ে,
নমু মুসলমানের লড়াই বাঁধলো হঠাৎ জমাট হয়ে।
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

সাউদ পাড়ার খাঁদের সাথে শিমুল তলীর ছিল বিবাদ,
নমুরে আজ সামনে পেয়ে অনেক দিনের নেবে যে দাদ।
ভাজনপুরের শেখরা এসে মিলল সাউদ পাড়ার দলে,
সড়কি লাঠি হস্তে লয়ে মাতলে তারা লড়াই রোলে।
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

আবার—

দুপুর বেলায় এলো রূপাই গাজনা চরের মাঠের পরে,
সঙ্গে এলো হাজার লেঠেল সরকি লাঠি হস্তে ধরে।
(নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

মোদরে খেতে ধান কেটেছে, কাল্‌কে যারা কাঁচির খোচায়,
আজকে তাদের নাকের ডগা বাঁধতে হবে লাঠির আগায়।
(নক্‌সী কাঁথার মাঠ)

এ কথাগুলিই জীবন্ত হয়ে উঠেছে কবি বন্ধু এবং ছোট বেলার খেলার সাথী আলী পুরের এক বিখ্যাত লেঠেলের কথায়। তিনি বলেন,—"কবি জসীমউদ্‌দীন

আমার বিশেষ বন্ধু। শুধু বন্ধুই নয়, বরং আমার অনেক সময়ের খেলার সাথী। ওর কথা মনে হলে আমি মুসরে পড়ি। কিন্তু উপায় নেই। তার সম্বন্ধেও তাঁর কাব্যের অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছেন কিন্তু কি বলবো।

নমহুদ্রের বসতি এখনো গোপালগঞ্জে আছে। এসব এলাকায় প্রায়ই নমু মুসলমানে একটি সূত্র নিয়েই মারামারি হত। চর নাটা খোলায় এখনো নমুদের বাস। এরা এককালে অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল। এদের মধ্যে রাম সুন্দর বৈদ্য ও তার ছেলে কৃষ্টমোহন বৈদ্য তৎকালে জোতদার ছিলো। কবির কাব্যে উল্লেখিত মেনাজউদ্দীন *লেঠেলও* বাস্তব *লেঠেল* ছিল। আমি এদের সাথে কয়েকবার লড়েছি।[৪৭]

১৯২৯ সালে রাজেন্দ্র কলেজ থেকে জসীমউদ্‌দীন বি. এ. পাশ করেন।[৪৮] ১৯৩১ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। এম. এ. পাশ না করা পর্যন্ত তিনি *ময়মনসিংহ গীতিকা* সংগ্রাহকের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশে দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতার কথা জসীমউদ্‌দীন অকপটে স্বীকার করে বলেছেন, ''দীনেশ বাবু জীবনের নানা ক্ষেত্রে একটা অবস্থা হইতে আর একটা অবস্থায় আমাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।''[৪৯] দীনেশচন্দ্র সেন জসীমউদ্‌দীনের কতবড় অনুরাগী এবং তাঁর প্রতি স্নেহশীল ছিলেন তা দীনেশ চন্দ্র সেনের আর একটি উক্তি থেকেই তা আমরা বুঝতে পারি—

''আমি গৌরবান্বিত যে আমি বংগ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছি এবং আরও গোররান্বিত যে, আমি ময়মনসিংহ গীতিকার মত বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ আবিষ্কার করে পৃথিবীর রস-পিপাসুদের সামনে তুলে ধরেছি। কিন্তু সব চাইতে আমার গৌরব যে, আমি কবি জসীমউদ্‌দীনের শিক্ষক হতে পেরেছি। তার কবিতা আমার কাছে শেলী, কীটস, বায়রণ এমন কি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার চেয়ে ভাল লাগে। কারণ তার কবিতায় আমি আমার বহুকাল ছেড়ে-আসা আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা সেই পল্লী মায়ের শীতল স্পর্শ পাই। সে মায়ের চেয়ে আপন বলতে আমি আর কাউকে জানিনে। তার পদ্ম-শালুক ফোটা খালবিল, ভাটিয়ালী গানে মুখর পদ্মা-যমুনা নদী, অতসী-অপরাজিতা, টগর-চামেলী ফুলের সুবাস-ভরা আঙ্গিনার কোল— মায়ের এই অপরূপ মূর্তি আমি খুঁজে পাই জসীমের কবিতায়।[৫০]

এম. এ. পাশ করার পর জসীমউদ্‌দীন দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অধীনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী গবেষক রূপে নিযুক্ত হন। তখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা বিভাগের প্রধান কর্তা। রবীন্দ্রনাথের পত্রের গুণে এবং ডঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী ও স্যার হাসান সারওয়ার্দীর চেষ্টায় জসীমউদ্‌দীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপগবেষক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন জসীমউদ্‌দীনের বন্ধু। কবি যখন বি.এ. ক্লাসে পড়েন তখন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কল্লোল-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচিতি জসীমউদ্‌দীনের জীবনে অনেক সহায়ক হয়েছিল।[৫১] শুধু তাই নয় "অবনীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারেই 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' পুস্তকের প্রত্যক অধ্যায়ের পূর্বে নানা গ্রাম হইতে আমার সংগৃহীত গ্রাম্য গানগুলির অংশ বিশেষ জুড়িয়া দিতাম। গানের পিছনে তারযন্ত্রের ঐকতানের মত তাহারা আমার পুস্তকের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বর্ণিত ভাবধারাকে আরও জীবন্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে। বর্তমান সংস্করণে বইখানি সচিত্র হইয়া বাহির হইয়াছে। অবন বাবু আমার নক্‌সী কাঁথার মাঠ পুস্তকের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।"[৫২]

এরও কিছুকাল পরে জসীমউদ্‌দীনের বন্ধু মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমেই জসীমউদ্‌দীন প্রথম রবীন্দ্রসান্নিধ্য লাভ করেন।[৫৩] জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার 'তাঁর সমস্ত অন্তর ভরিয়া দিয়াছিল'।[৫৪] জসীমউদ্‌দীনের *রাখালী* ও *নক্‌সী কাঁথার মাঠ* পড়ে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং শান্তিনিকেতন ফিরে গিয়ে মন্তব্য লিখেছিলেন-"অতি সহজে যাদের লেখবার শক্তি নেই এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।"[৫৫] রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসার গুণে নক্‌সী কাঁথার মাঠ সম্পর্কে যাঁদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁরাও আর জসীমউদ্‌দীনের বিরুদ্ধ সমালোচনায় সাহস পান নাই।[৫৬]

১৯৩০ সালে জসীমউদ্‌দীন যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাশের ছাত্র এ সময় তাঁর *বালুচর* কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ *বালুচর* সম্পর্কে জসীমউদ্‌দীনের সাক্ষাতে অনুযোগ করেন : "তোমার 'বালুচর' পড়তে গিয়ে বড় ঠকেছি হে, "বালুচর" বলতে আমি তোমাদের দেশের সুদূর পদ্মাতীরের চরগুলির সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা আশা করেছিলাম। কেমন চখাচখি উড়ে বেড়ায়, কাশ-ফুলের গুচ্ছগুলি বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু কতগুলি প্রেমের কবিতা দিয়ে তুমি বইখানাকে ভরে তুলেছ। পত্রে এ কথা লিখেলে পাছে রূঢ় শোনায় সে জন্য এ বিষয়ে কিছু লিখিনি। মুখেই বললাম।"[৫৭]

১৯৩২ সালে জসীমউদ্‌দীন কিছু দিনের জন্য বন্ধুবর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নীচের তলায় কয়েকটি ঘর ভাড়া করে প্রায় বৎসর খানেক ঠাকুর বাড়িতে থাকতেন।[৫৮] এই উপলক্ষে ঠাকুর পরিবারের প্রায় অনেকের সঙ্গে এবং শান্তিনিকেতনের অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।[৫৯] এই পরিচয় পরে এমন একটি মধুর সম্পর্কে পরিণত হয় যে পরবর্তী কালে জসীমউদ্‌দীনের অনেক গ্রন্থে তার

সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। তিনি লিখেছেন—"শান্তি নিকেতনের গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসে একটি বালিকা জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মেয়েটি অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া অতুলপ্রসাদের রচিত একটি গান গাহিল। "ওগো সাথী, মম সাথী, আমি সেই পথে যাব তব সাথে।" সে কী গান, দূর দূরান্তর হইতে ভাসিয়া আসা কোন নাম-না-জানা পাখির কণ্ঠস্বর। গান শেষ করিয়া মেয়েটি তার সুন্দর হাত দুইটি তুলিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাতলা একহারা চেহারা। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। নতুন ধানের পাতার সমস্ত বর্ণসুষমা কে যেন তাহার সমস্ত গায়ে মাখাইয়া দিয়াছে। মনে হইল, এমন গান কোন দিন শুনি নাই। এমন রূপও বুঝি আর কোথাও দেখি নাই। আজও তার গানের রেশ আমার কানে লাগিয়া আছে। আমার "সোজন বাদিয়ার ঘাট" পুস্তকে নায়িকার রূপ বর্ণনা করিতে আমি এই মেয়েটিকে মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলাম। এই পুস্তকের দুইটি অংশ। প্রত্যেক অংশের আগে অতুলপ্রসাদের এই গানটি আমি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। এই মেয়েটি কোথায় আছে জানিনা। হয়ত কোন সুন্দর স্বামীর ঘরণী হইয়া ছেলে মেয়ে লইয়া সুখে আছে। সে কোনদিনই জানিতে পারিবে না যে তার সেই ক্ষণিকের দর্শন আর সুমধুর গান আমাকে এই সুদীর্ঘ "সোজন বাদিয়ার ঘাটের" কাহিনী লিখতে সাহায্য করেছে। "[৬০]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাই ঝি হাসুকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। জসীমউদ্‌দীন লিখেছেন-"প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাইঝি হাসুকে লেখা কবিতাগুলি দিয়া আমার 'হাসু' পুস্তক খানি সাজাইলাম। "[৬১]

জসীমউদ্‌দীনের কবিতাকে নানাভাবে মান্য করার ব্যাপারে দীনেশচন্দ্র সেনের ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই, সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জহুরীর মত তিনি খাঁটি সোনা আবিষ্কার করেছিলেন। জসীমউদ্‌দীনের প্রতিভাকে স্বয়ং রবীন্দ্রানাথও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এই তরুণ কবিকে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হওয়ার এবং সাহচর্য লাভের সুযোগও পেয়েছিলেন কবি। রবীন্দ্রনাথ জসীমউদ্‌দীনকে একটি নাটকের প্লট বলে দেন। সেটা অবলম্বন করেই তিনি *পল্লীবধূ* নাটক লিখেছেন।[৬২] রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার ফলেই পরবর্তীকালে *বেদের মেয়ে, পল্লী বধু মধুমালার* মত বিখ্যাত লোক-নাট্যের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাখালী* প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ *মা গো জ্বালায়ে রাখিস আলো* কবির মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। জসীম

-উদ্‌দীনের কাব্যরচনার বিকাশ ও সমৃদ্ধ পর্ব ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। এ সময়ে প্রকাশিত *রাখালী, নকসী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, ধানখেত* ইত্যাদি। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যসাধনার প্রথম অবসান এবং নতুন পর্বের সূচনা। এই পর্বের সাহিত্য সাধনায় তিনি বৈচিত্র্যসাধনে তৎপর। এই নতুনতর পর্বের শুরুতেই ১৩৩৯ সালে মেরী মিলফোর্ড *নক্‌সী কাঁথার মাঠ* কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ করেন *The field of Embroidered Quilt.* এতে জসীমউদ্‌দীন আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকুরী ছেড়ে সরকারী প্রচার বিভাগে চাকুরী নিয়ে কলকাতায় যান এবং ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ঐ প্রচার দপ্তরের কর্মচারী রূপে আবার ঢাকা ফিরে আসেন।

১৯৬১ সালে তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত ১৪ বৎসর প্রচার দপ্তরে অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময় পারিপার্শ্বিক দেশ-কাল এবং কবির জীবন ছিল খুবই ঘটনা-বহুল। এই সময়ে তিনি দেশের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন উপলক্ষে গিয়েছেন এবং ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, স্কটল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক, বার্মা প্রভৃতি দেশে নানা উপলক্ষে এবং আন্তর্জাতিক লোক সাহিত্য সম্মেলনে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এর পর তিনি রাশিয়া ও জার্মানীও সফর করেন। ৬৩

এই নতুন পর্বের ১৯৪৬ সালে *রূপবতী*, এবং ১৯৫১ সালে *মাটির কান্না* এই দু'টি কাব্য প্রকাশিত হয়। *মাটির কান্না* কাব্যের অনেক পরে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত সকিনায় তিনি পুরানো কাহিনীকাব্যের খাতে অনুবর্তনের চেষ্টা করেছেন। ১৯৫০ সালে *পদ্মাপার* নামক গীতিনাট্য এবং এরও পরে *বেদের মেয়ে, পল্লী বধু, মধুমালা* রচনা করে আপন শিল্পপ্রতিভার বৈচিত্র্যের আধিকারী হয়েছেন। শিশুপাঠ্য কবিতা *এক পয়সার বাঁশি* (১৯৪৯) এবং রূপকথার ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত *ডালিম কুমার* (১৯৫২) *বাঙালীর হাসির গল্প* (১৯৬০) শিশুদের উপযোগী করে রচিত এ-পর্বেরই সৃষ্টি। এ-পর্বের সাহিত্যসাধনার উল্লেখযোগ্য ফসল *যাঁদের দেখেছি, চলে মুসাফির* (১৯৫৭), *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়* (১৯৬১)।

১৯৬১ সালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের সময় থেকে ১৯৭৬ সালে জসীমউদ্‌দীনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সময়সীমা তাঁর সাহিত্য-সাধনার শেষপর্ব বলে ধরা চলে। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত *মা যে জননী কান্দে*তে তিনি পুনরায় কাহিনীকাব্যের খাতে লেখনী চালনা করেন। *হলুদ বরণী* (১৯৬৬), *জলের লেখন* (১৯৬৯), *ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে* (১৯৭২) *মা গো জ্বালায়ে রাখিস আলো* (১৯৭৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের

মধ্যে একমাত্র *ভয়াবহ সেই দিন গুলিতে* কাব্যটির কিছুটা ব্যতিক্রম বাদে আর সবগুলিই গতানুগতিকতার স্তরে পৌছেছে। সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ *মা গো জ্বালায়ে রাখিস আলো* কাব্যে পল্লীর প্রতি গভীর মমত্ববোধ অতি করুণভাবে ফুটে উঠেছে। জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যসাধনার দ্বিতীয় পর্বে লোকনাট্য রচনার যে উদ্যম দেখা গিয়েছিল তা শেষ পর্বে এসে স্তিমিত হয়ে আসে। তাই শেষ পর্বে এসে *ও গো পুষ্পধনু* নামে একটি নাট্যকবিতা ও লোকনাট্য জাতীয় একটি সংকলন তিনি রচনা করেছেন। উপন্যাসের আঙ্গিকে *বোবা কাহিনী* (১৯৬৪) নামে গ্রন্থটি এ পর্বে রচনা করেন কিন্তু গ্রটি তেমন শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়নি। কবির নিজ স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ, *জীবনকথা* (১৯৬৪) ও *স্মৃতিরপট* (১৯৬৮)— এ দু'টি গ্রন্থ এ-পর্বেই রচিত। এ ছাড়া *হলদে পরীর দেশে* (১৯৬৫), *যে দেশে মানুষ বড়* (১৯৬৮) ও *জার্মানীর শহরে বন্দরে* (১৯৭৫) কবির ভ্রমণ অভিজ্ঞতামূলক গদ্যরচনা।[৬৪]

জসীমউদ্‌দীনের গদ্যরচনায় আমরা তাকে এক নিপুণ শিল্পীরূপে পাই। ছবি আঁকবার মতই কথা সাজানোর গুণ তাঁর ছিল। আর ছিল জীবনকে, মানুষকে দেখার ও ভালবাসার মত হৃদয়। বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ বাংলাদেশ, খাল-বিল, নদী-নালা, ধান-কাউনের, শাপলা-শালুকের বাংলাদেশ। পাখির কাকলি, বটের ছায়া, উড়ানীর চরের শোভা কত বিচিত্র রূপেই কবি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর কাব্যে। গদ্যরচনায়ও সে-আমেজ সৌরভের মত পাঠকের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে অধিকার করে। তাঁর গদ্যে তিনি যে ভাবে তাঁর মনের কথা রূপায়িত করেছেন, তাতে তাঁর কবিতার স্বকীয় রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। বাংলা কাব্যের মত অতি আধুনিক যুগে গদ্যেরও রূপবৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে। কিন্তু কাব্যে যেমন তিনি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন; গদ্যেও তেমনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। এবং তা তাঁর কাব্যের সঙ্গে যথার্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কবি জসীমউদ্‌দীন পল্লীর নিভৃত বন্দরে প্রবেশ করে আহরণ করেছেন বহুকালের প্রচলিত লোকসঙ্গীত, লোক-গাঁথা, উপকথা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, কিংবদন্তী ইত্যাদি। আর তাই তাঁর কলমের স্পর্শে হয়ে উঠেছে সজীব, আধুনিক বিশ্বের সাহিত্যসভায় হয়ে উঠেছে পরিচিত, সমাদৃত। জসীমউদ্‌দীন এ-সব সংগৃহীত লোক সঙ্গীতকে অতি আধুনিক পদ্ধতিতে সম্পাদনা করে *জারী গান* (১৯৬৮) এবং *মুর্শীদী গান* (১৯৭৭)-এ দু'টি গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। এই পর্বেই *সোজন বাদিয়ার ঘাট* *Gypsy wharf* নামে ইউনেস্কোর উদ্যোগে অনূদিত হয় এবং *বাঙালীর হাসির গল্প* বি-পেইন্টার দ্বারা *Folk-tales of Bangla-desh* (১৯৭৪) নামে অনূদিত হয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি *নক্‌সী কাঁথার মাঠ* ১৯৩৯

সালে মেরী মিলফোর্ড কর্তৃক অনূদিত হয়ে *The field of the Embroidered quilt* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক পরে এ-গ্রন্থটি ইটালীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইটালীর প্রখ্যাত কবি মেরিনো রিগোন জসীমউদ্‌দীনের কবিতাগুলোকে ভাষান্তরিত করেছেন। ইটালীয় ভাষায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থে জসীমউদ্‌দীনের ৬১টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এ-গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটে কলসী কাঁখে দু'টি গাঁয়ের বধূর ছবি আছে। ভাষান্তরিত কবিতাগুলোর মধ্যে 'ও বা'জান চল যাই/চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে'-ও রয়েছে। *মাটির কান্না* গ্রন্থটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের কিছু রচনা চেক ভাষায় চেক সাহিত্যিক দুশন জবাভিতেল অনুবাদ করেছেন। এসব অনূদিত রচনা ও কাব্যগ্রন্থ জসীমউদ্‌দীনের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বিস্তৃততর করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. কবিতার নাম, 'মিলন গান', *মোসলেম ভারত*, ১৩২৮, কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।
২. 'অম্বিকা প্রয়াণ', *মোয়াজ্জিন*, ১৩৩৫ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত।
৩. 'মাটির ডাক, *গণবাণী*, সাপ্তাহিক, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩৩
৪. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *জসীমউদ্‌দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*, পি. এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০, পৃ. ১৮, ৩২
৫. জসীমউদ্‌দীন, *যাঁদের দেখেছি* প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫২, 'নজরুল প্রসঙ্গে' শীর্ষক অধ্যায়ে জসীমউদ্‌দীনের জীবনে স্বদেশীর প্রভাব নির্দেশক বক্তব্য দ্রষ্টব্য।
৬. কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাখালী* প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। সর্বশেষ কাব্য গ্রন্থ *মা গো জ্বালায়ে রাখিস আলো* কবির মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়।
৭. *নক্সী কাঁথার মাঠ* সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে উদ্ধৃত অংশ। জসীমউদ্‌দীনঃ *যাঁদের দেখেছি*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫২, পৃ. ৮৪ জসীমউদ্‌দীন, *ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায়*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ৭ দ্রষ্টব্য।
৮. অধ্যাপক কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য, 'পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন', *মাসিক মোহাম্মদী*, ২৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-১৩৬০
৯. জসীমউদ্‌দীন, *সোজন বাদিয়ার ঘাট*, ষ্টুডেন্টস্ ওয়েজ, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৬০, কবি লিখিত 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
১০. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
১১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, 'জসীমউদ্‌দীন ও তার কবিতা—একটি ভূমিকা', *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৯, পৃ. ১৫১
১২. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
১৩. কালিদাস রায়, 'কবির বিদায়', *শারদীয়া বেতার জগৎ*, কলিকাতা, ১৯৫৭

১৪. কবি প্রদত্ত এ–জাতীয় সাক্ষাৎকারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২৪–১২–৬৪ তারিখে নিজ কমলাপুর, ঢাকাস্থ বাসভবন, 'পলাশবাড়ী'তে মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত *গ্রামের কথা* পত্রিকার প্রতিনিধি এম. ইয়াসিনকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ উক্ত গ্রামের *কথা* পত্রিকার ২য় বর্ষ ১৬শ ও ১৭শ যুগ্ম সংখ্যায় (বিজয় সংখ্যা রূপে চিহ্নিত) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঐ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী। উক্ত পত্রিকায় ৫–১৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এই সাক্ষাৎকারে কবির জীবন ও কাব্য সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য স্থান পেয়েছে।

১৫. *জসীমউদ্দীন*, *জীবন কথা*, ১ম খণ্ড, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৭৬, পৃ. ১৭

১৬. *জসীমউদ্দীন*, পূর্বোক্ত, 'আমার মা' 'আমার মায়ের সংসার', রাঙা ছুটুর বাপের বাড়ী' প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৫–৯২

১৭. কথক শরপ উল্লাহ, স্থানঃ গবিন্দপুর, বয়স ৭৫ সাক্ষাৎকার ৪–৭–৭৭, বিকাল–৪টা কবিবন্ধু শরপ উল্লাহ প্রদত্ত এ জাতীয় সাক্ষাৎকারের বিবরণ ১৯৭৯ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখের *সংগ্রাম* সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। স্মরণ থাকে যে, উক্ত সংবাদ পত্রের ৪ পৃষ্ঠায় শহিদুর রহমান, *পল্লীর প্রেক্ষাপটে জসীমউদ্দীনের প্রতিভা* নামাঙ্কিত প্রবন্ধে এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছেন। এতে জসীমউদ্দীনের বাল্যজীবন ও কাব্য সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য স্থান পেয়েছে। আমরা প্রয়োজনবোধে তা ব্যবহার করেছি।

১৮. এ প্রসঙ্গে ১৭, নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৯. *জসীমউদ্দীন*, তথ্যনির্দেশ, পৃ. ৪৯–৫০

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩–২৪

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯–৩১

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২–২৩

২৩. পূর্বোক্ত, "আমার অন্ধ দাদা" প্রসঙ্গে, পৃ. ৪৪

২৪. *জসীমউদ্দীন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০–১১১

২৫. *জসীমউদ্দীন*, *জীবন কথা*, (প্রথম খণ্ড) পূর্বোক্ত, নিম্নোক্ত মন্তব্য দ্রষ্টব্য—"তাহারাই আমার কাব্য জীবনের প্রথম গুরু। সেই যাদব পরিক্ষিত, ইসমাইল, হরিপাটনী, হরি আচার্য এদের কথা যখন ভাবি আমার অন্তর কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসিক্ত হইয়া ওঠে। 'কবিগান ও কবিতা রচনা প্রসঙ্গ', পৃ. ১১৭–১৩১

২৬. ক্ষিরোদ বাবু ফরিদপুর জেলার ইষাণ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি কবিতা লেখায় পারদর্শী ছিলেন।

২৭. *জসীমউদ্দীন*, পূর্বোক্ত, 'ফরিদপুর জেলা স্কুলে, 'ধীরেনদের বাসায়', 'মেজদি', 'সেজদি', প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৯৩–২৪৩

২৮. *জসীমউদ্দীন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩, কবিতাটি–

নায়ের মাঝি নায়ের মাঝি,
এখনো কেন শুয়ে?
বেয়ে চল তোর না খানি ভাই,
পাল তুলিয়া দিয়ে।

এম. ইয়াসিনঃ 'কবি জসীমউদ্‌দীন', *গ্রামের কথা,* (বিজয় সংখ্যা) ২য় বর্ষ, ১৬শ ১৭শ সংখ্যা, মুনসীগঞ্জ, ঢাকা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫, পৃ. ৮

২৯. জসীমউদ্‌দীন, 'নজরুল প্রসঙ্গে' *যাদের দেখেছি,* প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৫২, পৃ. ১৬–২০।

৩০. *জসীমউদ্‌দীন,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪। নজরুল ইসলামের চিঠির উদ্ধৃত অংশঃ "ভাই শিশু কবি তোমার কবিতা পেয়ে সুখী হলুম। আমি দখিন হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তোমাদের মত শিশু কুসুমগুলিকে যদি আমি উৎসাহ দিয়ে, আদর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি, সেই হবে আমার বড় কাজ। তারপর আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার হিমগিরির গহন বিবরে।"

৩১. প্রসংগতঃ স্মর্তব্য যে,কবিতাটির নাম 'মিলন গান'। এটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দে *মোসলেম ভারত* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।*জসীমউদ্‌দীন,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৩২. *জসীমউদ্‌দীন, যাঁদের দেখেছি,* পৃ. ২৪

৩৩. কবিতাটির কয়েকটি চরণ :

দিক হারায়ে এমন করে
যেজন কাঁদায় বারে বারে
ও সেই পথ উদাসী বন ফিরারে
কেমনে বাঁধি বারে বারে।
আজ কলাবনের বাবরি নাড়ি,
উত্তরে নাও দ্যায়রে পাড়ি
সাগড় বাড়ি
ও তার নূপুর ছোঁয়া শীতের কাঁপন
আমায় নে যায় কোন পাথারে।

এ কবিতাটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত হয়।

৩৪. মুহম্মদ মনসুরউদ্‌দীন, 'জসীমউদ্‌দীন', *বেতার বাংলা,* (কবি জসীমউদ্‌দীন স্মরণে) জসীমউদ্‌দীন চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকী, মার্চ প্রথম পক্ষ ১৯৮০, বেতার প্রকাশনা দপ্তর, ঢাকা–৫,পৃ. ২

৩৫. জসীমউদ্‌দীন, *স্মরণের সারণী বাহি,* পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৭৮, পৃ. ১১

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪–১৫

৩৯. এম. ইয়াসিনঃ 'কবি জসীমউদ্‌দীন', *গ্রামের কথা,* (বিজয় সংখ্যা) ২য় বর্ষ, ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যা, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫, পৃ.১০
নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্রষ্টব্য: "দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত "কবর" শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন। তাঁহার বড় ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ীতে কয়েকজন লোক এক সঙ্গে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই শোকাবহ ঘটনা কবিমনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি উক্ত মর্মস্পর্শী ও সকরুণ কবিতাটি রচনায় মনোনিবেশ করেন।"
এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম, *জসীমউদ্‌দীন (কবি ও কাব্য)* ১৯৫৬, পৃ. ৩৭। 'কবর' কবিতার উৎস সম্পর্ক মন্তব্য দ্রষ্টব্য। তিনিও এই একই বক্তব্য রেখেছেন।

৪০. *জসীমউদ্‌দীন : স্মরণে স্মরণী বাহী,* পৃ.১৫ এবং *যাঁদের দেখেছি* গ্রন্থের পৃ.৭১

"কল্লোল–এ 'কবর' কবিতা প্রকাশ সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে এটিই কল্লোলে প্রকাশিত কবির প্রথম রচনা। একথা সঠিক নয়। 'কবর' কল্লোলে প্রকাশিত জসীমউদ্‌দীনের তৃতীয় রচনা। এর পূর্বে ১৩৩১ সালের কার্তিক (৭ম) সংখ্যা এবং অগ্রহায়ণ (৮ম) সংখ্যা কল্লোলে যথাক্রমে কবির 'কাহিনী' (সাহিত্য চিন্তামূলক রচনা) এবং 'ভাটির মায়া' নামক কবিতা প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৩২ সালের আষাঢ় (৩য়) সংখ্যায় 'কবর' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ১৩৩১ সাল থেকে ১৩৩৬ সাল পর্যন্ত কবি আই. এ. এবং বি. এ. শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন এই ৫/৬ বৎসর 'কল্লোলের' সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন এবং এই সময়ে কবির আরও ১৩টি গদ্য/পদ্য রচনা কল্লোলে প্রকাশিত হয়েছে।"

দ্রষ্টব্যঃ আলমগীর জলীল 'কল্লোলের জসীমউদ্‌দীন', *বই*, দ্বাদশ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, (জসীমউদ্‌দীন সংখ্যা) জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ঢাকা, মে–জুন, ১৯৭৬, পৃ. ১৭–১৮

৪১. জসীমউদ্‌দীন, *যাঁদের দেখেছি*, পৃ. ৭১ *স্মরণের স্মরণীবাহী* পৃ. ১৫

৪২. জসীমউদ্‌দীন, *যাঁদের দেখেছি*, পৃ. ৭২। *স্মরণের স্মরণীবাহী*, পৃ. ১৫–১৬

৪৩. জসীমউদ্‌দীন, *যাঁদের দেখেছি*, পৃ. ৭২। *স্মরণের স্মরণীবাহী*, পৃ. ১৬

৪৪. 'কবর' কবিতাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেকসানে স্থান পেলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কবিতাটি কোথা থেকে তুলে দিয়েছেন তা উল্লেখ না করায়–*কল্লোল* সম্পাদক ১৩৩৫ সালে আশ্বিন সংখ্যা *কল্লোল*–এ লিখেছিলেন : "কল্লোলের পাঠকবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' নামে কবিতাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেকসান পুস্তকে সংকলিত হইয়াছে। আমাদের সকলেরই ইহা আনন্দের বিষয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংকলন পুস্তকে যে সকল লেখা সন্নিবেশেত হইয়াছে তাহার সবগুলিই কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে কেবল মাত্র 'কবর' কবিতাটি কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তা স্বীকার করা হয় নাই। 'কবর' কবিতাটি একমাত্র 'কল্লোল' পত্রেই প্রকাশিত হয়। কবি জসীমউদ্‌দীনের এখন পর্যন্ত কোন কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। যিনি এই সংকলন কার্য সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহার এই ক্রটিকে হয়ত অনেকেই শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, তিনি যদি এখনও এই ক্রটিটি সংশোধন করিয়া লন তাহা হইলে কাহারো মনে আর কোন রূপ ভুল ধারণা থাকিবেনা।" (*কল্লোল*, আশ্বিন, ১৩৩৫, পৃ. ১৮)

৪৫. ১৩৩৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা, *বিচিত্রায়* দীনেশ চন্দ্র সেনের 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য.
দ্রষ্টব্যঃ জসীমউদ্‌দীন, *যাঁদের দেখেছি*, পৃ. ৭৩–৭৪

৪৬. জসীমউদ্‌দীনঃ *স্মরণের স্মরণী বাহী*, পৃ. ৫৮
যাদের দেখেছি, 'দীনেশচন্দ্র প্রসঙ্গ', প. ৭৫

৪৭. কথকঃ আবদুল হমিদ মিঞা, বিখ্যাত *লেঠেল* বলে অঞ্চলে মিনিস্টার বলে খ্যাত। বয়স ৭০, বাড়ীঃ আলীপুর, সাক্ষাৎকার ২–৭–৭৭
দ্রষ্টব্যঃ শহীদুর রহমান, 'পল্লীর প্রেক্ষাপটে জসীমউদ্‌দীনের প্রতিভা' নামাঙ্কিত প্রবন্ধ, *সংগ্রাম*, ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃ. ৪

৪৮. এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, আই. এ. পাশ করার পর কাব্যচর্চা, লোকগীতি সংগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে তিনি অনেক সময় নষ্ট করেন। তাই পাঁচ বছর বিলম্বে বি. এ. পাশ করেন। এ প্রসঙ্গে এম. ইয়াসিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭ দ্রষ্টব্য।

৪৯. জসীমউদ্‌দীন, *যাঁদের দেখেছি*, দীনেশ প্রসঙ্গে, পৃ. ৭২
৫০. জসীমউদ্‌দীন, *স্মরণের স্মরণী বাহী*, পৃ. ৫১
৫১. জসীমউদ্‌দীনঃ অবন ঠাকুরের দরবারে, *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা-৫ম সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ৪৪-৫৩
৫২. জসীমউদ্‌দীন, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৪-৫৩
৫৩. জসীমউদ্‌দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫ *যাঁদের দেখেছি*, পৃ. ৮৩-৮৪
৫৪. জসীমউদ্‌দীন, *যাঁদের দেখেছি*, পৃ. ৮৩-৮৪ *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়*, পৃ. ৬
৫৫. জসীমউদ্‌দীন, *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়*, পৃ. ৭, *যাঁদের দেখেছি*, পৃ. ৮৪
৫৬. *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়*, রবীন্দ্রতীর্থে, পৃ.৭ *যাঁদের দেখেছি*, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, পৃ. ৮৪
৫৭. *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়*, পৃ. ৮
৫৮. *যাঁদের দেখেছি*, পৃ. ১০০
৫৯. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০), শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, (১৮৮৩-১৯৬৬) শান্তিদেব ঘোষ এবং আরো অনেক জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্য লাভ করেছিলেন।
৬০. *ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়*, পৃ. ১০-১৫
৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৮
৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২, *যাঁদের দেখেছি*, পৃ. ৮৮-৯০
৬৩. এম. ইয়াসিন লিখিত, 'কবি জসীমউদ্‌দীন' শীর্ষক প্রবন্ধ, *গ্রামের কথা*, ২য় বর্ষ, বিজয় সংখ্যা, ১৯৬৫
৬৪. স্মর্তব্য যে, *হলদে পরীর দেশে* গ্রন্থটি কবির যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণ কাহিনী। *যে দেশে মানুষ বড়* গ্রন্থটি কবির রাশিয়া এবং *জার্মানীর শহরে বন্দরে* গ্রন্থটি কবির জার্মানী সফরের অভিজ্ঞতা।